International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-I, Issue VI, July 2015, Page No. 19-25
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘কপালকুণ্ডলা’ : ইকোফেমিনিজমের আলোকে

সিদ্ধেশ্বর ব্যানার্জী
গবেষক, বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Patriarchal structure always wants to exploit and oppress women and nature. For own convenience and existence this structure can do anything, even damaging the other side. Eco-feminism protests against this. Eco-feminists want the unpolluted, unchanged nature; they want bondage-free life of women. Bankimchandra Chattyopadhyay, the first Bengali Novelist also protests against the women and nature capturing procedure in his novel, named ‘Kapalkundala’. We can find the various features of eco-feminism in this novel. Mainly the inseparable relation between women and nature is well-depicted by the author. Kapalkundala, the heroine, does not like to be confined in the patriarchal structure in the name of ‘Marriage’. She at last becomes free from all narrow relationship. So we are interested to read this novel in the light of eco-feminism.

Keywords: Kapalkundala, Eco-Feminism, Free, Nature, Women

(১)

একালের অন্যতম উপন্যাসিক দেবেশ রায় তাঁর ‘উপন্যাসভাবনা’ নিবন্ধে লিখেছেন —

> “উপন্যাসের অন্বিষ্ট সমাজ নয়, সময় নয়, ইতিহাসও নয়, উপন্যাসের অন্বিষ্ট ব্যক্তিমানুষ। এই সমাজ, সময় আর ইতিহাস ব্যক্তিমানুষের চরিত্র ও মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক জটিল করে দেয়। ফলে মানুষের সংজ্ঞা বারবারই নতুন করে খুঁজতে হয়। তাই মানুষকে খুঁজতে গিয়ে এই সমাজ, সময় আর ইতিহাসকেও খুঁজতে হয়। সময়, সমাজ আর ইতিহাসধৃত ব্যক্তিমানুষ হচ্ছে উপন্যাসের অন্বিষ্ট।”[১]

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ বদলায়, বদলায় যুগের গতি, বদলে যায় মূল্যবোধের ধারণা, সংস্কার, আচার-বিচার। তাই দেশে-দেশে, যুগে-যুগে তৈরি হয় নানান সাহিত্যিক তথা শৈল্পিক মতবাদ। শিল্প-সাহিত্য বিচারের মানদণ্ডও যায় বদলে। সেই বদলে যাওয়া মানদণ্ডে পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন হয়ে পড়ে চিরায়ত শিল্প-কর্ম, সাহিত্য। বিশেষ করে কোন একটি সাহিত্যিক সংরূপের আদি সৃষ্টিগুলি নতুন মতবাদের আলোকে পাঠ, বিচার বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে তা অনেক বেশি সত্য; কারণ জীবনের সঙ্গে, ব্যক্তির সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সংলগ্ন এই উপন্যাস।

বিশ শতকের শেষদিকে ‘দ্বিতীয় লিঙ্গ’ নারীর সামাজিক, রাষ্ট্রিক, পারিবারিক অবস্থানকে নতুন একটি দৃষ্টিকোণে দেখার, বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা দেখা যায়। ইকোক্রিটিসিজমের একটি শাখা হিসেবে গৃহীত হয় ইকোফেমিনিজম। ১৯৭৪ সালে ফ্রাঁসোয়া দ্য ওবোঁন (Françoise d'Eaubonne) তাঁর ‘লে ফেমিনিজম উলামো’ (Le Féminisme ou la Mort) গ্রন্থে ‘ইকোফেমিনিজম’ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। ইকোফেমিনিজমের একটি মান্য সংজ্ঞা হল–

> "Eco-feminism is a movement that sees a connection between the exploitation and degradation of the natural world and the subordination and oppression of women. It

emerged in the mid-1970s alongside second-wave feminism and the green movement. Eco-feminism brings together elements of the feminist and green movements, while at the same time offering a challenge to both. It takes from the green movement a concern about the impact of human activities on the non-human world and from feminism the view of humanity as gendered in ways that subordinate, exploit and oppress women."[২]

এই মতবাদের ভিত্তি সম্পর্কে বিপ্লব মাজী লিখেছেন,

> "মানবী-নিসর্গবাদীদের একটি প্রধান প্রোজেক্ট woman-nature সম্পর্কে mystifies না করে দৃশ্যায়িত করে তোলা – প্রকৃতি ও মানবীর পক্ষে যা কিছু অশুভ ও মন্দ তা থেকে মুক্তি দিতে হবে। woman-nature সম্পর্কই হল eco-feminism-এর মূল ভিত্তি।"[৩]

নারীবাদী ও পরিবেশবাদীদের যৌথ আন্দোলনের ভিতরে রয়েছে নারী ও প্রকৃতির সাদৃশ্য অন্বেষণের প্রয়াস। নারী নিপীড়নের সঙ্গে প্রকৃতি ধংসের একটি নিবিড় যোগ আছে বলেই ইকোফেমিনিস্টরা মনে করেন। তাঁরা আরও মনে করেন যে, লিঙ্গভিত্তিক অধিকারের পার্থক্য মানবতার পরিপন্থী। লিঙ্গভিত্তিক সমাজ-সংস্কৃতিকে তাঁরা নস্যাৎ করতে বদ্ধপরিকর।

সুতরাং ইকোফেমিনিজমের আলোকে কোন পাঠ বিশ্লেষণ করার অর্থ হবে, নারীর সঙ্গে প্রকৃতির সংযোগের দিকটি অন্বেষণ করা; পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোয় নারী ও প্রকৃতি কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে তা খতিয়ে দেখা; লিঙ্গবৈষম্যের কারণে অধিকারবোধের একপেশে ক্ষেত্রগুলি কীভাবে অবস্থান করছে তা তুলে ধরা; পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর বিরুদ্ধে কোন সোচ্চার কণ্ঠস্বর আছে কিনা তা আবিষ্কার করা।

(২)

প্রকৃতির সঙ্গে নারীর সংযোগ কতখানি তা একেবারে বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত কবি-সাহিত্যিকদের নারীরূপ বর্ণনাপ্রসঙ্গে প্রকৃতির অনুষঙ্গ আনয়নেই ধরা পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর ব্যতিক্রম নন। বিশেষত 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে নারীরূপ আর প্রকৃতি যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এব্যাপারে তিনি সংস্কৃত কবি নাট্যকারদের কাছে, বিশেষভাবে মহাকবি কালিদাসের কাছে ঋণী।

প্রথমেই ধরা যাক, কপালকুণ্ডলার রূপ বর্ণনাপ্রসঙ্গ। লেখকের কলমে–

> "অপূর্ব মূর্ত্তি! সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণীমূর্ত্তি! কেশভার-অবেণীসম্বন্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্‌ফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না-তথাপি মেঘবিচ্ছেদ নিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ম্ময়; সে কটাক্ষ, এই সাগরহৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণলেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল।"[৪]

পুরোপুরি প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে এবং প্রকৃতির অনুষঙ্গে উপমা-রূপকের মাধ্যমে লেখক কপালকুণ্ডলার রূপ বর্ণনা করেছেন। সচেতন লেখকের তাই স্পষ্ট মন্তব্য–

> "অর্দ্ধচন্দ্রনিঃসৃত কৌমুদিবর্ণ; ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল; পরস্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ, কি চিকুর, উভয়েরই যে শ্রী বিকশিত হইতেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে, সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না।"[৫]

কপালকুণ্ডলার রূপ সম্পর্কে মতিবিবির মন্তব্যটিও এপ্রসঙ্গে স্মরণীয়–

> "এ ফুল রাজোদ্যানেও ফুটে না।"[৬]

পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনাতেও প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মক মনোভাব বিধৃত হতে দেখা যায়।

> "বর্ষাকালে বিটপীলতা যেমন আপন পত্ররাশির বাহুল্যে দলমল করে, ইহার শরীর তেমনি আপন পূর্ণতায় দলমল করিতেছিল;...পূর্ণচন্দ্রকরলেখা, অথবা হেমাম্বুদকিরীটিনী ঊষা, যদি গৌরাঙ্গীদিগের বর্ণনা হয়, তবে বসন্তপ্রসূত নবচূতদলরাজির শোভা এই শ্যামার বর্ণের অনুরূপ বলা যাইতে পারে।"[৭]

অথবা,

> "সুন্দরীর বয়ঃক্রম সপ্তবিংশতি বৎসর-ভাদ্র মাসের ভরা নদী। ভাদ্রমাসের নদীজলের ন্যায়, ইহার রূপরাশি টলটল করিতেছিল-উছলিয়া পড়িতেছিল। বর্ণাপেক্ষা, নয়নাপেক্ষা, সর্ব্বাপেক্ষা সেই সৌন্দর্য্যের পরিপ্লব মুগ্ধকর। পূর্ণযৌবনভরে সর্ব্বশরীর সতত ঈষচ্চঞ্চল; বিনা বায়ুতে শরতের নদী যেমন ঈষচ্চঞ্চল, তেমনি চঞ্চল; ..."[৮]

শুধু রূপ-বর্ণনাতেই নয়, নারী চরিত্র প্রকাশেও বঙ্কিম প্রকৃতিকে উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপক অলঙ্কার প্রয়োগের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন। যেমন-

ক) শ্যামাসুন্দরী নিজের জীবনকে ফুলের সঙ্গে তুলনা করেছে। তবে সেই ফুল ফুটে ওঠার আগেই ঝরে গেছে। তাই তার কণ্ঠে বৌদির সঙ্গে কথোপকথনে ঝরে পড়ে আক্ষেপ-

> "শ্যা। বল দেখি ফুলটি ফুটিলে কি সুখ?
>
> মৃ। লোকের দেখে সুখ, ফুলের কি?
>
> শ্যামাসুন্দরীর মুখকান্তি গম্ভীর হইল; প্রভাতবাতাবহ নীলোৎপলবৎ বিস্ফারিত চক্ষু ঈষৎ দুলিল; বলিলেন, 'ফুলের কি? তাহা ত বলিতে পারি না। কখনও ফুল হইয়া ফুটি নাই। কিন্তু যদি তোমার মতো কলি হইতাম, তবে ফুটিয়া সুখ হইত।' "[৯]

খ) স্বামীহারা, প্রস্ফুটিতযৌবনা পদ্মাবতীর স্বভাব সম্পর্কে কথক বলেন—

> "তাঁহার মনোবৃত্তি সকল দুর্দ্দমবেগবতী। ইন্দ্রিয় দমনে কিছুমাত্র ক্ষমতাও নাই, ইচ্ছাও নাই। এ কার্য্য সৎ, এ কার্য্য অসৎ, এমত বিচার করিয়া তিনি কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন না; যাহা ভাল লাগিত তাহাই করিতেন।... মনে মনে ভাবিলেন, কুসুমে কুসুমে বিহারিণী ভ্রমরের পক্ষচ্ছেদ কেন করাইব?"[১০]

গ) যুবরাজ সেলিম পদ্মাবতী (লুৎফউন্নিসা)-র রূপজ মোহে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁর স্ত্রী থাকলেও, তিনি মেহের-উন্নিসার প্রেমে আসক্ত হলেও তাকে ছাড়তে নারাজ। এমনকি যখন শুনলেন পদ্মাবতী তার পূর্ব স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চায়, তখনও তিনি নিজের আসক্তির কথা বলতে দ্বিধা করলেন না। কিন্তু পদ্মাবতী নিজেকে অতটা বিকিয়ে দিতে রাজী নয়। এই ঘটনাটির বর্ণনাপ্রসঙ্গেও এসেছে আকাশ, চন্দ্র-সূর্য, কণ্টক-ফুলের উপমা-

> 'বাদশাহ রহস্য হাস্য করিয়া পরে গম্ভীর হইলেন। কহিলেন, "প্রেয়সি! তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। তোমার যদি সেই প্রবৃত্তি হয়, তবে তদ্রূপই কর। কিন্তু আমাকে কেন ত্যাগ করিয়া যাইবে? এক আকাশে কি চন্দ্র সূর্য্য উভয়েই বিরাজ করেন না? এক বৃন্তে কি দুটি ফুল ফুটে না?"
>
> লুৎফ-উন্নিসা বিস্ফারিতচক্ষে বাদশাহের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "ক্ষুদ্র ফুল ফুটিয়া থাকে, কিন্তু এক মৃণালে দুইটি কমল ফুটে না। আপনার রত্নসিংহাসনতলে কেন কণ্টক হইয়া থাকিব?"[১১]

এমনকি, 'কপালকুণ্ডলা'য় স্নেহ-প্রেম-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি অনুভূতিগুলির বর্ণনাতেও এসেছে প্রকৃতির অনুষঙ্গ। দু-একটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝে নাওয়া যাক।

ক) সুখের আকাঙ্ক্ষাকে পদ্মাবতী ঝর্নার সঙ্গে, নদীর সঙ্গে তুলনা করেছে—

> "এই সুখাকাঙ্ক্ষা পার্ব্বতী নির্ঝরিণীর ন্যায়, - প্রথমে নির্ম্মল, ক্ষীণ ধারা বিজন প্রদেশ হইতে বাহির হয়, আপন গর্ভে আপনি লুকাইয়া রহে, কেহ জানে না; আপনাআপনি কল কল করে, কেহ শুনে না। ক্রমে যত যায়, তত দেহ বাড়ে, তত পঙ্কিল হয়। শুধু তাহাই নয়; কখনও আবার বায়ু বহে, তরঙ্গ হয়, মকর কুম্ভীরাদি বাস করে। আরও শরীর বাড়ে, জল আরও কর্দ্দময় হয়, লবণময় হয়, অগন্য সৈকত চর-

> মরুভূমি নদীহৃদয়ে বিরাজ করে, বেগ মন্দীভূত হইয়া যায়, তখন সেই সকর্দ্দম নদীশরীর অনন্ত সাগরে কোথায় লুকায়, কে বলিবে?"[১২]

খ) নবকুমারের প্রতি লুৎফ-উন্নিসা বা পদ্মাবতীর প্রেম জাগরণের ঘটনাক্রমকে কথক একটি অঙ্কুর থেকে বেড়ে গাছ হয়ে ওঠার রূপকে এক আশ্চর্য ভাষাভঙ্গিমায় বর্ণনা করেছেন–

> "ক্ষেত্রে বীজ রোপিত হইলে আপনিই অঙ্কুর হয়। যখন অঙ্কুর হয় তখন কেহ জানিতে পারে না-কেহ দেখিতে পায় না। কিন্তু একবার বীজ রোপিত হইলে, রোপণকারী যথায় থাকুন না কেন, ক্রমে অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ মস্তক উন্নত করিতে থাকে। অদ্য বৃক্ষটি অঙ্গুলি পরিমেয় মাত্র, কেহ দেখিয়াও দেখিতে পায় না। ক্রমে তিল তিল বৃদ্ধি। ক্রমে বৃক্ষটি অর্দ্ধ হস্ত, এক হস্ত, দুই হস্ত পরিমিত হইল; তথাপি, যদি তাহাতে কাহারও স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা না রহিল, তবে কেহ দেখে না, দেখিয়াও দেখে না। দিন যায়, মাস যায়, বৎসর যায়, ক্রমে তাহার উপর চক্ষু পড়ে। আর অমনোযোগের কথা নাই, -ক্রমে বৃক্ষ বড় হয়, তাহার ছায়ায় অন্য বৃক্ষ নষ্ট করে,— চাহি কি, ক্ষেত্র অনন্যপাদপ হয়।"[১৩]

লুৎফ-উন্নিসার প্রণয়বৃক্ষ শেষ পর্যন্ত কপালকুণ্ডলার সংসারকে ভেঙে ছারখার করে দেয়।

(৩)

ইকোফেমিনিজম অনুযায়ী পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থা কিংবা শাসনকাঠামোয় কয়েকটি দ্বিমেরু বিষমতার মধ্য দিয়ে নিপীড়নের ছবি ফুটে ওঠে।

> "Eco-feminism claims that patriarchal structures justify their dominance through categorical or dualistic hierarchies: heaven/earth, mind/body, male/female, human/animal, spirit/matter, culture/nature, white/ non-white."[১৪]

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে সতীত্ব-অসতীত্ব, দেহ-মন, নারী-পুরুষ, আদর্শ-বস্তুগত চাহিদা, সর্বোপরি শুভাশুভের বৈপরীত্য প্রস্ফুটিত হতে দেখা যায়। কপালকুণ্ডলা প্রথাগত সতীত্বের ধারণাকে আমল না দিলেও মনের দিক থেকে সে সৎ, পবিত্র। অন্যদিকে আপাতভাবে অসতী বলে মনে হলেও পদ্মাবতী, ওরফে লুৎফউন্নিসা, ওরফে মতিবিবি সমস্ত বস্তুগত চাহিদাকে ত্যাগ করে সমাজ-নির্দেশিত সতীত্বের ধারণায় পুণ্যস্নাত হতে চেয়েছে—

> "আমি তোমার জন্য আগ্রার সিংহাসন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তুমি আমায় ত্যাগ করিও না।"[১৫]

মোঘল-পাঠানের যুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাবে পদ্মাবতীদের জাত-ধর্ম যায়, চিরতরে হারিয়ে যায় স্বামী নবকুমারের সঙ্গে সংসার করার সম্ভাবনা। ঘটনাচক্রে চোদ্দ বছর পর আবার দেখা হলে পুরনো প্রেম ডালপালা মেলে ফুলে-ফলে পল্লবিত হতে চায়। অবশ্য, এই মধ্যবর্তী সময়কালে সে যে কীভাবে নিপীড়িত হয়েছে তার বর্ণনা ফুটে ওঠে তার আক্ষেপপূর্ণ আত্মবিশ্লেষণে-

> "অনেক দিন আগ্রায় বেড়াইলাম, কি ফললাভ হইল? সুখের তৃষা বাল্যাবধি বড়ই প্রবল ছিল। সেই তৃষার পরিতৃপ্তির জন্য বঙ্গদেশ ছাড়িয়া এ পর্যন্ত আসিলাম। এ রত্ন কিনিবার জন্য কি ধন না দিলাম? কোন্ দুষ্কর্ম না করিয়াছি? আর যে যে উদ্দেশ্যে এতদূর করিলাম, তার কোনটাই বা হস্তগত হয় নাই? ঐশ্বর্য্য, সম্পদ্, ধন, গৌরব, প্রতিষ্ঠা সকলই তো প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিলাম। এত করিয়াও কি হইল? আজ এইখানে বসিয়া সকল দিন মনে মনে গণিয়া বলিতে পারি যে, এক দিনের তরেও সুখী হই নাই, এক মুহূর্ত্ত জন্যও কখনও সুখভোগ করি নাই। কখনও পরিতৃপ্ত হই নাই। কেবল তৃষা বাড়ে মাত্র। চেষ্টা করিলে আরও সম্পদ্, আরও ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারি, কিন্তু কি জন্য? এ সকলে যদি সুখ থাকিত, তবে এত দিন এক দিনের তরেও সুখী হইতাম।"[১৬]

সুখের সন্ধানেই পদ্মাবতী কপালকুণ্ডলাকে স্বামীছাড়া করে নিজের স্বামীকে দখল করতে চায়। কিন্তু এজন্য তাকে পুরোপুরি পাপী বলা যায় না। কারণ, সে যখন জানতে পারে কাপালিক কপালকুণ্ডলাকে মারার জন্য ষড়যন্ত্র করছে, তখন হৃদয়ের নির্মল

ভালবাসার তাড়নাতেই বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়ে। এমনকি কৌশলে কপালকুণ্ডলাকে বাঁচাতে চায়। বাসস্থান, খাদ্য-সংস্থান সব কিছুর ব্যবস্থা করে সে কপালকুণ্ডলাকে কাপালিকের হাত থেকে রক্ষা করে নিজে স্বামীকে ফিরে পেতে চায়। স্বার্থবোধের কারণে তাকে হীন বলে মনে হলেও তার জীবনের প্রতারণার, প্রবঞ্চনার দিকটিও সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করতে হবে। এখানে তুলনায় কপালকুণ্ডলার উদার সর্বত্যাগী মানসিকতা আমাদের অভিভূত করে। প্রকৃতির উদার প্রাঙ্গণে লালিত-পালিত হওয়ার ফলেই তার এই উদারতাবোধ জন্মেছিল বলে মনে হয়। এরকম সরল উদারতার পরিচয়, আগেও পাওয়া যায়। মতিবিবির দেওয়া যাবতীয় গয়না সে এক ভিখিরিকে নির্দ্বিধায় দান করে।

(৪)

ইকোফেমিনিজম লিঙ্গ-বৈষম্য, আধিপত্যবাদ আর পরিবেশের ধ্বংস হওয়ার বিরুদ্ধে বিশেষভাবে প্রতিবাদী। এই ধরণের প্রতিবাদ 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে যথেষ্ট সোচ্চার। সমাজে পুরুষের অবাধ স্বেচ্ছাধীন ঘোরাফেরা, যাতায়াতের অধিকার আছে। কিন্তু নারীকে পদে পদে কৈফিয়ত দিতে হয়। কপালকুণ্ডলা বুঝতে পারে না পুরুষের মতো নারীর কেন স্বাধীন গতিবিধি নেই, কেন কৈফিয়তের সম্মুখীন হতে হয়। পুরুষ-বেশী পদ্মাবতীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় সেজন্য তার মনোভাব খুবই স্পষ্ট-

> "পতিব্রতা যুবতীর পক্ষে রাত্রিকালে নির্জ্জনে অপরিচিত পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ যে অবিধেয়, ইহা ভাবিয়া তাহার মনে সঙ্কোচ জন্মে নাই; তদ্বিষয়ে তাহার স্থির সিদ্ধান্তই ছিল যে, সাক্ষাতের উদ্দেশ্য দূষ্য না হইলে এমত সাক্ষাতে দোষ নাই - পুরুষে পুরুষে বা স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে যেরূপ সাক্ষাতের অধিকার, স্ত্রী পুরুষে সাক্ষাতের উভয়েরই সেইরূপ উচিত বলিয়া তাঁহার বোধ ছিল; ..."[১৭]

কিন্তু পুরুষশাসিত সমাজে এই বোধ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। আগের রাতে শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে বনে যাওয়ায় শ্যামাসুন্দরীকে লাথিঝাঁটা, গালিগালাজ খেতে হয়েছে। তাই সে আর যেতে রাজী নয়। বৌদি মৃন্ময়ীকেও যেতে দিতে সে গররাজী। কারণ লোকে পাঁচকথা বলবে, তা সহ্য করা ভদ্রঘরের মানুষের পক্ষে কঠিন। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার রাতে যাওয়ার কারণ, কুলীন স্বামীকে বশে রাখা। শ্যামাসুন্দরীর বৈবাহিক জীবন কেমন ছিল সেপ্রসঙ্গে লেখকের শাণিত মন্তব্য-

> "নবকুমার পিতৃহীন, তাঁহার বিধবা মাতা গৃহে ছিলেন, আর দুই ভগিনী ছিল। জ্যৈষ্ঠা বিধবা; ... দ্বিতীয় শ্যামাসুন্দরী সধবা হইয়াও বিধবা; কেন না, তিনি কুলীনপত্নী।"[১৮]

স্বামীকে কাছে ধরে রাখার জন্য বনজ ঔষধ ব্যবহার করতে হয়। পরোপকারী কপালকুণ্ডলা নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও ননদিনীর উপকার করতে চায়। এও একধরণের প্রতিবাদ বই কি! সমাজের কৌলীন্যকে বন্দী করে ফেলার নারীসুলভ প্রচেষ্টা। নারীর অবমাননাসূচক বিবাহ-বন্ধন ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কপালকুণ্ডলার তীব্র মনোভাব ধরা পড়ে এই উক্তিতে—

> "যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।"[১৯]

এটি নারীর কাছে শুধু যে আক্ষেপসূচক উক্তিই নয়, তার প্রমাণ দেখা যায় নবকুমারের সঙ্গে পরবর্তী কথোপকথনে। নবকুমার তাকে কোনোমতেই একা ছেড়ে দিতে চায় না, যদি একান্ত কপালকুণ্ডলাকে যেতেই হয় তবে সেও তার সহচর হতে চায়। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের কঠোর সমালোচনা এবং প্রতিবাদ কপালকুণ্ডলার উক্তি—

> "আইস, আমি অবিশ্বাসিনী কি না, স্বচক্ষে দেখিয়া যাও।"[২০]

লিঙ্গবৈষম্য ও আধিপত্যবাদ পুরুষতান্ত্রিক সমাজকাঠামোয় কতটা ভয়ংকর হতে পারে তার চূড়ান্ত সাক্ষী হয়ে ওঠে নবকুমার। সেই কাঠামোর মধ্যে থাকার কারণেই সে প্রাণের চেয়ে প্রিয় কপালকুণ্ডলাকে কাপালিকের হাতে তুলে দেওয়ার মতো কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কিন্তু, প্রকৃতিলগ্ন কপালকুণ্ডলার স্নেহ-ভালবাসার স্পর্শে তার মানবিক বোধ অনেকটা জেগে উঠেছিল। তাই কাপালিকের উত্তেজক পানীয়ের প্রভাব কেটে যেতেই কপালকুণ্ডলাকে সে বলে—

> "তুমি তো কখনও আপনার হৃৎপিণ্ড আপনি ছেদন করিয়া শ্মশানে ফেলিতে আইস নাই।"[২১]
>
> কিন্তু কপালকুণ্ডলার ততদিনে সব প্রেমের বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে। তাই নবকুমারের কাছে নিজের পবিত্রতা স্বীকার করলেও আর ঘরে ফিরে যেতে চায় না।

"আমি অবিশ্বাসিনী নহি। একথা স্বরূপ বলিলাম। কিন্তু আর আমি গৃহে যাইব না।"[২২]

(৫)

প্রকৃতি আর নারীর যোগ যে অবিচ্ছেদ্য তা ইতিহাসের পাতায় পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। বিশেষত ভারতীয় মহাকাব্যের মধ্যে নারী আর প্রকৃতি যেন একাকার হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ তো রামায়ণের সীতা-হরণের কাহিনিকে কৃষি সভ্যতার সঙ্গে বানিজ্যিক সভ্যতার তথা শিল্প-সভ্যতার দ্বন্দ্ব হিসেবেই দেখতে চেয়েছেন।[২৩] আমরা যত বেশি শিল্পসভ্যতার সুবিধা ভোগ করতে চাইছি, তত জড়িয়ে পড়ছি প্রকৃতি নাশে, আর তারই সঙ্গে বিনষ্ট করে ফেলছি নারীপ্রকৃতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলিকে। ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে সৃষ্টি হচ্ছে নানান বিভ্রাট। নারীর প্রতি পুরুষের, পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর নানান উপদ্রব-অত্যাচার বেড়ে চলেছে। তাই আমাদের সচেতন হতে হবে। আমরা যেন নবকুমারের মতো মানসিকতায় সরল পবিত্র নারীপ্রকৃতি কপালকুণ্ডলাকে অবিশ্বাস করে বিনষ্টির পথে, সমাজ-সংসারের বাইরে বের না করে দিই। কপালকুণ্ডলার সরল উদার প্রকৃতি আজ বড় কাঙ্ক্ষিত। বস্তুবাদী, ভোগবাদী সভ্যতায় প্রকৃতিরূপী নারী কপালকুণ্ডলাকে আজ খুঁজে পাওয়া মুশকিল, কিন্তু ইকোফেমিনিস্ট মানসিকতায় আমাদের সেই পথে হাঁটতে হবে। কবে আমরা খুঁজে পাব জানি না!

তথ্যসূত্র

১. রায় দেবেশ, উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৬, পৃষ্ঠা: ৮৭

২. Mellor Mary, "Feminism & Ecology", New York University Press, 1997, p.1

৩. মাজী বিপ্লব, ইকোফেমিনিজম নারীবাদ ও তৃতীয় দুনিয়ার প্রান্তিক নারী, কলকাতা, অঞ্জলি পাবলিশার্স, ২০১১, পৃষ্ঠা: ১৪

৪. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিম, কপালকুণ্ডলা। http://www.bankim.rachanabali.nltr.org/node/415, পৃষ্ঠা: ১১,

৫. ঐ, পৃষ্ঠা - ১১

৬. ঐ, পৃষ্ঠা - ২৬

৭. ঐ, পৃষ্ঠা - ২৩

৮. ঐ, পৃষ্ঠা - ২৩

৯. ঐ, পৃষ্ঠা - ৩১

১০. ঐ, পৃষ্ঠা - ৩২

১১. ঐ, পৃষ্ঠা - ৪১

১২. ঐ, পৃষ্ঠা - ৪৩

১৩. ঐ, পৃষ্ঠা - ৪৪

১৪. http://ebookbrowsee.net/hobgood-oster-ecofeminism-international-evolution-pdf-d16907892

১৫. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিম, কপালকুণ্ডলা। http://www.bankim.rachanabali.nltr.org/node/415, পৃষ্ঠা: ৪৫

১৬. ঐ, পৃষ্ঠা: ৪৩

১৭. ঐ, পৃষ্ঠা: ৫৩

১৮. ঐ, পৃষ্ঠা: ২৮

১৯. ঐ, পৃষ্ঠা: ৪৮

২০. ঐ, পৃষ্ঠা: ৪৮

২১. ঐ, পৃষ্ঠা: ৬৩

২২. ঐ, পৃষ্ঠা: ৬৩

২৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রক্তকরবী। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫

গ্রন্থঋণ :

1. চৌধুরী ভূদেব, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়), ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ
2. দত্ত বিজিতকুমার, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭
3. দত্ত ভবতোষ, চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম দে'জ সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৮
4. দাশগুপ্ত প্রফুল্লকুমার, উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ০৯, প্রজ্ঞাবিকাশ, তৃতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৬
5. দে নাড়ুগোপাল, উনিশ শতকে বাংলা রেনেসাঁস ও বঙ্কিমচন্দ্র, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ০৯, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, ২০১০
6. বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (অষ্টম খণ্ড), ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় সংস্করণ ২০১০-১১
7. বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম সংস্করণ, ২০১০-২০১১
8. ভট্টাচার্য অমিত্রসূদন, প্রবন্ধ পঞ্চাশৎ বিষয় বঙ্কিমচন্দ্র, ১৮ এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা ৭০০০০২, প্রতিভাস, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৪
9. ভট্টাচার্য অমিত্রসূদন, বঙ্কিম সৃষ্টি সমীক্ষা, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০১১
10. সেন সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয়-পঞ্চম খণ্ড), ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, সপ্তম মুদ্রণ, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ